গোলামের বিবি সাহেবের টেক্কা

অভীক মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল ট্রয়কা পাবলিকেশন

ভূমিকা

রাজনীতি, এই শব্দটা যখনই শুনি আমার চোখ চলে যায় আমার ঘরে রাখা আমার মাতামহর প্রকাণ্ড ছবিটার দিকে। সেই ছবিটা, ছবিটার বিষয়ে শোনা গল্পগুলো রাজনীতির প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে অবিরাম আমাকে সচেতন করে চলে।

স্কুলের মাস্টার ছিলেন আমার মাতামহ। সত্তর সালের ঘটনা বলছি, কাজেই বোঝাই যায় সাধারণ স্কুল মাস্টারের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা কতটা ছিল সেই সময়ে! দশের পাত পড়ত আমার মামার বাড়িতে সেই সময়, প্রায় প্রতিদিন, যেখানে তিন জনের ভাত সংকুলান ছিল কষ্টসাধ্য। রাজনীতি সেদিনও ছিল,আজও আছে। শুধু দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টেছে, তাই নয় কি?

আমার মাতামহ নিজের বিয়েতে এসেছিলেন রিকশা চেপে, রিকশাতে চাপান ছিল একটা কম্বল, বলা হয়েছিল বসন্তের রোগীকে হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি থামেননি, পদের লোভে নয়, কাঞ্চনমূল্যের লোভে নয়, দায়ভারের দায়িত্বে তিনি এগিয়ে গেছেন। মাত্র সাঁইত্রিশ বছর বয়সে তাঁর জীবন থেমে গেছিল, সিরোসিস অফ লিভার, আজীবন এক পাত্র সুরা না ছুঁয়ে। শেষের সেই দিনে ডাক্তার বলেছিল, দীর্ঘদিন অনাহারে এবং অর্ধাহারে গোপালবাবু তার জীবনটা শেষ করে দিলেন।

আমি বা অভীক কেউই কোনদিন সেই পর্যায়ে পৌঁছাতে পারব না। ঠিক যেমন আমি পৌঁছাতে পারব না অভীকের রাজনৈতিক মেধা, প্রজ্ঞা ও লেখনীর ধারেকাছেও। অভীকের সাথে আমার দীর্ঘ রাজনৈতিক আলোচনা হয় প্রায়ই, বলাই বাহুল্য তার যুক্তিগ্রাহ্য মতামত এবং পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণের সামনে আমি যারপরনাই পর্যদুস্ত হই প্রায় প্রতি সময়েই।

কিন্তু তাও আমি অভীকের সাথে রাজনৈতিক তর্কে নামি অহরহ, তার কারণ, আমার গল্পে শোনা মাতামহর পর আমার এই বন্ধুটির রাজনৈতিক সচেতনতা আমাকে মুগ্ধ করে। স্বচ্ছ বিচার এবং ভাবধারা রাজনীতির গল্পে, বিতর্কে এবং আলোচনার একটি অন্যতম বিশুদ্ধ নিয়ম, যা অভীক কখন ক্ষুণ্ণ করেনি।

ব্যাক্তি অভীক এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষক অভীক সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি চরিত্র। আমার মাতামহ তাইই ছিলেন,তিনি তার ভাবাদর্শ কারোর ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেননি বরং তার শ্রোতাদের এবং পাঠকদের শিখিয়েছেন তুল্যমূল্য বিচার করে তাদের অনুরূপ মতবাদকে গ্রহণ করতে, যে মতবাদে শ্রোতা বা পাঠক স্বছন্দ্য। কাজেই যে তাঁবেদাররা কোন দল বা মত অনুযায়ী অভীকের এই কাজটি পড়বেন তাদের জন্য হতাশা অবশ্যম্ভাবী। কারণ বিশ্লেষক এবং লেখক অভীক একটি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ চরিত্র।

একরকম যেচেই এই বইটির ভূমিকা আমি লিখেছি। আমার মনে হয়েছে, অভীক যে কথাগুলো কোনদিন নিজে কোনদিন বলতে পারবে না, তার কথাগুলো বন্ধু হিসেবে

বলে দেওয়াটা আমার কর্তব্য। যাতে "যেতে যেতে একলা পথে" তার বাতি কোনদিন না নেভে, ঝড় হিসেবে তার সাথী হওয়ার দায়িত্ব অনুভব করেছি।

গোলামের বিবি কে, আর রাজার বা রাজাদের টেক্কা বা টেক্কারাই বা কারা, তা জানতে গেলে পড়তে হবে এই বইটি। অভীকের নিরলস পরিশ্রম এবং প্রকাশনার সাধু এই উদ্যোগটি আপনাদের ভালো লাগবে বলেই আশা করি। শুধু একটি অনুরোধ থাকবে,

—আমার বন্ধুটিকে দাগিয়ে দেবেন না, আমাদের, অনেকের এই ছেলেটির কাছ থেকে অনেক কিছু পাওয়ার আছে।

নীলাদ্রি মুখার্জী
বইমেলা,২০২২

সূচিপত্র

নারায়ণ... নারায়ণ...
১৩

নাম কামরাজ
৪৪

ম্যাডাম
৭৬

ময়ূর বিহার থেকে জেল তিহার
১০০

নারায়ণ... নারায়ণ...

নারায়ণ এক ধরনের ভারতকে রেখে আমেরিকায় পড়াশোনা করতে গিয়েছিলেন। এক ভারতকে ছেড়ে রেখে গিয়েছিলেন, কিন্তু ফিরলেন অন্য এক ধরনের ভারতে। ইংরেজিতে যাকে বলে, ইয়াং ইন্ডিয়া। যাওয়ার আগে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ দেখে গিয়েছিলেন, ফেরার পরে দেখলেন বিদ্রোহ চলছে। আগে বলা হত, 'স্বরাজ চাই!' এবার বলা হচ্ছিল, 'পূর্ণ স্বরাজ চাই!'

নারায়ণ ফিরেই প্রথমে দেখা করলেন গান্ধীজির সঙ্গে।

গান্ধীজি জিজ্ঞাসা করলেন, "তা এবার কী করবে?"

"বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে সোশিওলজি পড়াতে চাই।"

"আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি মালব্যজির সঙ্গে কথা বলে দেখছি। কিন্তু কে পড়তে আসবে এই সময়ে? পারবে পড়াতে? পণ্ডিতজির সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা হয়েছে? সর্দার এখন বারদোলিতে আছে। দেশের কাজ এখন এঁরাই দেখছেন।"

"হ্যাঁ। পণ্ডিতজি আমাকে এলাহাবাদে ডেকেছেন। কিন্তু

আমি সেখানে গিয়ে কী করব বুঝতে পারছি না।”

এই যে মালব্যজি, ইনি হলেন মদনমোহন মালব্য। সর্দার হলেন সর্দার বল্লভভাই পটেল। আর যে পণ্ডিতজির উল্লেখ করা হচ্ছে, তিনি শ্রী জওহরলাল নেহরু। নেহরুজি নিজের কুশাগ্র বুদ্ধিমত্তা দিয়ে ধরে ফেলেছিলেন যে, নারায়ণ কোনো সাধারণ কংগ্রেস কর্মকর্তা নন। এবং তাঁর মধ্যে মার্ক্সবাদের প্রভাবও রয়েছে যথেষ্ট।

তখন জহরলাল নেহরু এবং সুভাষচন্দ্র বসু টিম সাজাচ্ছেন। ইয়াং ইন্ডিয়ার জন্য ইয়াং ব্লাড চাই। কলকাতা আর মুঙ্গেরে পূর্ণ স্বরাজের কনসেপ্ট নিয়ে নবীন আর প্রবীণদের মধ্যে মতান্তর চলছিল। লাহোরের নদী তীরে নেহরুজি দেশের পতাকা উত্তোলন করে দিলেন। পূর্ণ স্বরাজের ঘোষণা হয়ে গেল।

এলাহাবাদে যাওয়া নিয়ে নারায়ণের মনে দ্বিধা ছিল, কিন্তু পড়ানোর জন্য বেনারসে না গিয়ে চলে গেলেন এলাহাবাদে। মজদুরদের সঙ্গে নিয়মিত দেখা করতে থাকলেন।

গান্ধীজি গেলেন গোলটেবিল বৈঠকে। উদ্দেশ্য ছিল পূর্ণ স্বরাজ। সেখানে তারকার মতো উঠে এলেন এক প্রভাবশালী বাগ্মী পুরুষ— বি আর আম্বেদকর। গান্ধীজির সঙ্গে দ্বন্দ্ব হল মত নিয়ে। ভারতে নতুন ভাইসরয় হয়ে এলেন লর্ড উইলিংডন। তাঁর কাজ হয়ে দাঁড়াল একটাই— কংগ্রেস দলটাকে শেষ করা। সাহেব এসেই বললেন, “ওসব কংগ্রেস ফংগ্রেস চলবে না। পার্টি ব্যান করে দিলাম।” সব নেতাকে ধরে জেলে ভরা হল। মোট ১,২০,০০০ কর্মী গ্রেফতার হলেন। স্বরাজ-টরাজ কিছুই

মিলল না, পুরো কংগ্রেস টিমটাই চলে গেল জেলে।

নেহরু সমেত সব বড় নেতা তখন গারদে। টিম চালানোর দায়িত্ব নারায়ণের ওপরে এসে পড়ল। তিনি গুপ্তভাবে কংগ্রেস চালাচ্ছিলেন। আইনি কাগজপত্র জমা করার জন্য একজন পার্সি ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশ নিয়ে চলে গেলেন বোম্বে। সেখান থেকেই কাজ সারলেন। যেসব নেতাদের গ্রেফতার করা হয়নি, নারায়ণ তাঁদের ডেকে পাঠালেন বেনারসে। কিন্তু কেউ ডাবল গেম খেলছিল। সব খবর আগে থেকেই ব্রিটিশদের কাছে চলে গিয়েছিল। উপস্থিত নেতাদের প্রায় অর্ধেককে অ্যারেস্ট করে ফেলল পুলিশ। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা যেসব বড় পুঁজিপতিদের সম্মানের চোখে দেখি, তাঁদেরই মধ্যে একজনের পূর্বপুরুষ খবরগুলো পাচার করছিলেন। নারায়ণ তাঁকে চিহ্নিতও করে ফেলেছিলেন। বুঝে গিয়েছিলেন, পুঁজিপতিরা আসলে কারো নয়। তাঁরা লাভের জন্য সবকিছু করতে পারেন।

নারায়ণের পরের টার্গেট ঠিক করা হয়ে গিয়েছিল। তাঁর ইচ্ছে ছিল, দিল্লীতে ভাইসরয়ের নাকের ডগাতেই একটা মিটিং করে দেখাবেন। দিল্লীর চাঁদনি চকে আয়োজন হল। জমায়েত হল। জিগির উঠল— ইনকিলাব জিন্দাবাদ। আজ্ঞে হ্যাঁ, কংগ্রেসের মিটিং-এ এটাও ঘটেছিল। সে এক অবিস্মরণীয় ব্যাপার। ভাইসরয় চমকে উঠলেন।

বোম্বে গেল। দিল্লী গেল। নারায়ণের পরবর্তী লক্ষ্য ছিল মাদ্রাজ। মাদ্রাজেও অধিবেশন হল।

পরিকল্পনা মতো কাজ চললেও নারায়ণ বুঝতে পারছিলেন, এবার তিনি ধরা পড়ে যাবেন। নারায়ণ

নাম কামরাজ

আমাদের দেশের রাষ্ট্রভাষা কী?

এদেশের বিবিধতার কারণে নির্দিষ্ট কোনো একটি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া যায়নি। তবে হিন্দি আমাদের দেশের রাজভাষা। দেবনাগরী লিপি যারা জানেন, এবং হিন্দির ভাই-বোন ভাষাগুলোতে যারা কথা বলেন, তাঁদের ক্ষেত্রে রাজভাষা রূপে হিন্দিটা সহজই মনে হবে। কিন্তু এখানেও আবার 'কিন্তু পরন্তু'র খেলা আছে। হিন্দিতে উর্দু, আওধি, ভোজপুরি, মৈথিলী, পাঞ্জাবি শব্দ মিশে আছে। মায় বাংলার সঙ্গেও বহুবিধ শব্দের মিল পাওয়া যায়। কিন্তু যখনই দক্ষিণ ভারতের ভাষার কথা উঠবে, তখন কী হবে? দক্ষিণী ভাষা থেকে সমার্থক শব্দগুলিকে ধার নিয়ে কি হিন্দিতে ব্যবহার করা হয়? অন্তত ন্যূনতম কয়েক শতাংশের মিল থাকলেও চলত, সেটাই বা কই? তাহলে ভারতীয়দের ওপরে 'হিন্দি আরোপিত' করার অভিযোগ কি সত্যি?

আসুন, সুধী পাঠক। আমরা বরং সংবিধান সভার সেই বৈঠকে ফিরে যাই, যেখানে ভাষা নিয়ে দল গাওয়াগাওয়ি

চলেছিল।

১৯৪৬ সালের ১০ই ডিসেম্বর। কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি অব ইন্ডিয়ার নির্বাচিত সদস্য পণ্ডিত রঘুনাথ ধুলেকর সংসদে বলতে উঠলেন। এবং তিনি হিন্দিতে ভাষণ দিতে লাগলেন। বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ তাঁকে থামালেন, "দয়া করে ইংরেজিতে বলুন, যাতে অ-হিন্দিভাষী বন্ধুরাও ব্যাপারটা বুঝতে পারেন।"

ধুলেকর একগুঁয়ে লোক। তাঁর বক্তব্য দাঁড়াল, "যারা হিন্দুস্তানি ভাষা বোঝেন না, তাঁদের ভারতে থাকার কোনো অধিকার নেই। এদিকে আপনারা এখানে ভারতের সংবিধান রচনা করতে বসেছেন, আর হিন্দুস্তানি ভাষাটাই জানেন না! তাহলে তো এখানে থাকাই সাজে না।"

আমরা আসব এর পরের কথায়। কিন্তু মোটামুটি '৪৬ সালের আশপাশের একটা ডেটাবেসে চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক। এর পাঁচ বছর পরে, মানে ১৯৫১ সালে যে জনগণনা হয়েছিল, তার নিরিখে ৪৫% ভারতীয়র ভাষা ছিল হিন্দি, উর্দু কিংবা পাঞ্জাবি।

ধরে নিলাম, আরও তিরিশ শতাংশ মানুষ হিন্দি আহামরিভাবে বলতে না পারলেও চলনসইভাবে ভাষাটা বোঝেন। তাহলেও কত মানুষ হিন্দির ছাতার বাইরে ছিলেন?

— ২৫%।

সংখ্যাটা নেহাত কম নয়। ভারতের মতো একটি দেশের ২৫% জনগণ মানে কিন্তু বহু মানুষ। ধুলেকর পণ্ডিতের নিদান মানলে এই ২৫% ভারতবাসীর ভারতে থাকার অধিকারই থাকত না। এবং সেটাও তিনি কোন

দিনে বলছেন? না সংবিধান রচনার প্রথম দিবসেই।

আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রথম দিনেই একথা বলছেন। আর তার মানে হল একদিনের মধ্যে যে হিন্দি ভাষাটা শিখতে পারবে, সে ভারতে থাকবে। না পারলে থাকতে পারবে না। একদিনে কি কোনো নতুন ভাষা শিখে ফেলা সম্ভব? এ কেমন বিচার, বাপু? আচ্ছা, তাও ধুলেকরের নামের আগে পণ্ডিত ছিল বলে একটা বেনিফিট অব ডাউট দিচ্ছি। কিন্তু এটা বলুন দেখিনি, যদি এই সংবিধান রচনার কেন্দ্রটি দিল্লীর বুকে না হয়ে দাক্ষিণাত্যের কোথাও হত, তাহলে কি উত্তর ভারতের তামাম লোকজন একদিনে কোনো দক্ষিণী ভাষা শিখে ফেলত? মাদ্রাসে সভা বসলে একদিনে শিখে ফেলতে পারত কি তামিলটাকে? যদি পূর্ব ভারতের কলকাতায় হত, তাহলে কি বাংলাই হত সবার ভাষা?

আমি বিজ্ঞ বা অভিজ্ঞ কোনটাই নই, তাই আমার কথা আপনাদের ভালো লাগবে না জানি রে বাবা। আবার ওই সভাটায় ফ্ল্যাশব্যাক করছি। সংবিধান সভাতে কি দক্ষিণের কোনো নেতা ছিলেন না? আলবাত ছিলেন। মাদ্রাস থেকে আগত টি টি কৃষ্ণামাচারী উঠে দাঁড়ালেন।

তিনি নিশানা দাগলেন, "সাম্রাজ্যবাদের অনেকতর রূপের মধ্যে একটি হল ভাষা সাম্রাজ্যবাদ। ইংরেজি আমার একেবারেই পছন্দ নয়। শেক্সপিয়ার কিংবা মিল্টনে কোনো রুচি নেই। শক্তিশালী ইংরেজরা আমাদের ইংরেজির দাসত্ব করিয়েছে। আর এখন আপনারা ক্ষমতাবান উত্তর ভারতীয় হিসেবে আমাদের হিন্দির গোলাম বানাতে চাইছেন। ছোট থেকে (হিন্দি) শিখলে সে না হয় একটা আলাদা কথা ছিল, কিন্তু এই বুড়ো বয়েসে এসে এই

ম্যাডাম

সঞ্জয় গান্ধীর মৃত্যুর পরে সবকিছু বদলে যাচ্ছিল। ইন্দিরা গান্ধীর হাতে রাশ থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেস পার্টি পালটাচ্ছিল। পরিবারে রদবদল আসছিল। মেনকা গান্ধীর তখন কতই বা বয়স— তেইশ কী চব্বিশ। বিধবা নারী। তাও আবার এমন একজন ভারতীয় বিধবা, যাঁর দিকে সারা দেশ তাকিয়ে রয়েছে। এদিকওদিক ঘোরাঘুরি করা, সার্বজনীন পার্টিতে অংশ নেওয়া— এসব সম্ভব ছিল না। তবে কেউ কেউ বলেছেন যে, মেনকা পার্টি অ্যাটেন্ড করতেন, সঞ্জয়ের মৃত্যুর পরেও। বাড়িতে সহানুভূতির পরিবেশ যে ছিল না তা নয়, তবুও একাকীত্বে ভুগতে আরম্ভ করেছিলেন সঞ্জয়ের প্রিয়তমা। প্রিয় ছেলে সঞ্জয় চলে যাওয়ার শোকটা ইন্দিরা গান্ধীও ভুলতে পারছিলেন না। অল্পেতেই রেগে উঠতেন, তিরিক্ষি মেজাজ। মেনকার ওপরে ঝাল ঝাড়তেন।

ভবিষ্যতের চিন্তা চলছিল। শুধু কংগ্রেসের মধ্যেই নয়, চলছিল গান্ধী–পরিবারের অভ্যন্তরেও। আর মেনকার মা অমতেশ্বর আনন্দ্ মেনকার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত ছিলেন।

তিনি ইন্দিরা গান্ধীর সামনে দুটো শর্ত রাখলেন—

এক, মেনকাকে যুব কংগ্রেসের অধ্যক্ষ করে দেওয়া হোক।

এবং দুই, অমেঠির সিট যেন ভবিষ্যতে মেনকাই পায়।

দ্বিতীয় শর্তটা তৎক্ষণাৎ পূরণ করা এমনিতেও সম্ভব ছিল না। লোকসভার ভোটে দাঁড়ানোর জন্য ন্যূনতম বয়ঃসীমা যেহেতু পঁচিশ বছর ছিল, তাই মেনকার পক্ষে অমেঠি কেন অন্য কোনো লোকসভা সিটেও দাঁড়ানো যেত না। ইন্দিরা রাজীবকে রাজনীতির ময়দানে চাইছিলেন। অমেঠি থেকে ভোটে দাঁড় করানোর অভীপ্সা ছিল। ওদিকে সোনিয়া এবং মেনকার মধ্যে দূরত্ব বাড়ছিল। মেনকার রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে সোনিয়া পছন্দ করছিলেন না।

ইন্দিরা গান্ধীর সামনে তখন দুটো বিকল্প উঠে আসছিল। একটাকে পছন্দ করলে অন্যটাকে দূরে সরিয়ে দিতে হচ্ছিল। দুটো অপশনকেই একসঙ্গে বেছে নিলে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে আরম্ভ হয়ে যেত পাওয়ার গেম। কংগ্রেস ভেঙে যেত। ইন্দিরা গান্ধীর ঘনিষ্ঠবৃত্ত যেমন পুপুল জয়কর, আর কে ধাওয়ান, ধীরেন্দ্র ব্রহ্মচারী, খুশবন্ত সিংহ প্রমুখরা সঞ্জয়ের উত্তরসূরী কে হবে তা নিয়ে ইন্দিরাকে মন্ত্রণা দিয়ে চলেছিলেন।

ভারতের রাজনীতির এক অদ্ভুত মায়া আছে। যে যখন উচ্চাকাঙ্ক্ষী হতে চেয়েছে, তখনই তাকে পাওয়ার পয়েন্ট থেকে সরে যেতে হয়েছে। ব্যতিক্রম শুধু দু'জন ব্যক্তি— জওহরলাল নেহরু এবং নরেন্দ্র মোদি। বাকি সকলেই চুজেন, বেছে নেওয়া হয়েছে। প্রত্যেককে। তাঁরা যতটা ভাবেননি, ততটা পেয়েছেন। মেনকার মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা

ছিল। ভারতীয় রাজনীতির ট্র্যাডিশন মেনে ইন্দিরা তাই প্রমাদ গণলেন। মেনকার মায়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ইন্দিরাকে ভীত করে তোলার জন্য যথেষ্ট ছিল। তিনি তাঁকে নিজের বাড়িতে আসতে মানা করে দিলেন। মেনকা নিজের বাপের বাড়িতে গিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করে আসতেন।

রাজীবকে রাজনীতির ব্ল্যাক করিডোরে পা রাখতেই হল। সিদ্ধান্ত হল, অমেঠিতে দাঁড়াবেন রাজীব। অমেঠির রাজকুমার সঞ্জয় সিংহ রাজীবের পাশে পাশে থাকলেন। রাজীব তখন নভিশ। সাংবাদিকরা খিল্লি করছিল, মজা নিচ্ছিল। রাজনীতিতে প্রায় জ্ঞানশূন্য রাজীবকে ঘিরে ফেলছিল মিডিয়া। রাজীবকে প্রশ্ন করলে রাজীব একই রকমের উত্তর দিতেন, "ম্যায় আপকো কেয়া বতাউঁ?" একবার তো একটা নয়, দুটো নয় পরপর পনেরোটা প্রশ্নের এই একই উত্তর দিয়েছিলেন রাজীব।

একজন সাংবাদিক সবশেষে প্রশ্ন করলেন, "পাঞ্জাবের ব্যাপারে আপনার কী অভিমত?"

"ম্যায় আপকো কেয়া বতাউঁ?" এই বাঁধাধরা উত্তর এল রাজীবের দিক থেকে।

সাংবাদিক বললেন, "কিঁউ কি ইয়ে রাষ্ট্রীয় মুদ্দা হ্যায়।"

"তো মম্মি সে পুছিয়ে... মেরা মতলব হ্যায় প্রধানমন্ত্রীজি সে পুছিয়ে।"

পরেরদিন খবরের কাগজের শিরোনামে ছাপা হল— 'মম্মি সে পুছিয়ে!'

এই শিরোনাম একটাই দিকে ইঙ্গিত করছিল— রাজীব গান্ধী রাজনীতি এবং দেশের ব্যাপারে কোনো জ্ঞানই রাখেন না। দলের পরিচালনা তাঁর দ্বারা সম্ভব ছিল না।